ইউনিট- ৪

ফসল চাষ

ভূমিকা

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের খাদ্য প্রয়োজন। এ খাদ্য আসে সরাসরি ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে। খাদ্য ছাড়াও মানুষের বিভিন্ন রকম চাহিদা আছে। এই চাহিদা মেটাবার জন্য মানুষ আদিকাল থেকে বিভিন্ন রকম অর্থকরী ফসল যেমন- ধান, পাট, গম, আলু, তুলা, প্রভৃতি চাষ করে আসছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আগেকার দিনের পদ্ধতি দ্বারা উৎপাদিত ফসল মানুষের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে পারছে না। এজন্য বর্তমানে কৃষিবিজ্ঞানীরা নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আগের চেয়ে বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের ফলন বহুগুন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এ ইউনিটে আপনারা ধান, পাট, আলু, সরিষা ও মসুর ডাল চাষাবাদের প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

পাঠ- ৪.১ : ধান চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ধান চাষের জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- ধানের উন্নত জাতের নাম বলতে পারবেন।
- ধানের বীজ শোধন ও চারা তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধানের জমি তৈরি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ধানের চারা রোপণের পদ্ধতি ও পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।
- ধানের বালাই দমন, কর্তন ও সংরক্ষণের বিবরণ দিতে পারবেন।

জমি নির্বাচন

ধানের ফলন সব ধরনের জমিতে ভাল হয় না । মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন সবচেয়ে ভাল হয়। মাঝারি উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা হয়। কিন্ড়ু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। এঁটেল ও পলি দো-আঁশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী।

জাত

বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে।

১। **স্থানীয় জাত :** টেপি, গিরবি, দুধসর, বতিশাইল ইত্যাদি।

২। **স্থানীয় উন্নত জাত :** হবিগঞ্জ, কটকতারা, পাজাম, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজার শাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।

৩। **উচ্চ ফলনশীল জাত :** মুক্তা, ময়না, শাহজালাল, মঙ্গল, নিজামী ইত্যাদি।

নিচে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১। ধান গাছ খাটো ও শক্ত হয় এবং সহজে হেলে পড়ে না।
২। ধান গাছের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু থাকে।
৩। পাতাগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে একটি অন্যটিকে ঢেকে রাখে না। এতে আলো–বাতাস প্রতিটি পাতা সমানভাবে পায় এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি তৈরি হয়।
৪। গাছ মাটি থেকে বেশি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে।
৫। জমি থেকে উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজন প্রায় সমান হয় অর্থাৎ ১ঃ১।
৬। পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
৭। পাকার সময়ও কিছু কিছু ধান সবুজ থাকে।

বীজের পরিমাণ

চারা তৈরির জন্য প্রতি কাঠা বীজতলায় ২.৫ - ৩.০ কেজি বীজ বুনতে হয়। এক কাঠা বীজতলার চারা দিয়ে ২০ কাঠা জমিতে ধানের চারা রোপণ করা যায়।

বীজ শোধন

ধানের বীজে যাতে রোগজীবাণু না থাকে সেজন্য ওষুধ দ্বারা শোধন করে নিতে হয়। প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম এগ্রোসান জি এন বা ২০ গ্রাম এগ্রোসান এম ৪ ওষুধ দ্বারা শোধন করতে হয়।

চারা তৈরি

ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়।

১। শুকনা বীজতলা;
২। ভিজা বীজতলা;
৩। ভাসমান বীজতলা;
৪। দাপোগ বীজতলা।

উঁচু ও দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমিতে শুকনা বীজতলা এবং নিচু ও এঁটেল মাটি সম্পন্ন জমিতে ভিজা বীজতলা তৈরি করা হয়। আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয়। প্রচুর আলো–বাতাস থাকে ও বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ডুবে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয়। এখানে শুকনা ও ভিজা বীজতলা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

শুকনা বীজতলা

জমিতে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে যাতে বীজ ভালোভাবে গজাতে পারে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে ফেলতে হবে এবং পরিমাণ মতো পচা গোবর সার বা আবর্জনা পচা সার দিতে হবে। বীজতলায় রসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম। হালকা বুনটের মাটি হলে ১১/২-২ টন জৈবসার দিলে ভালো হয়। বীজতলার মাপ–

বীজতলার বেডের দৈর্ঘ্য	=	সুবিধামত লম্বা
বেডের প্রস্থ	=	১২৫ সে.মি

জমির আইল বা বেডের মাঝখানের দূরত্ব = ২৫ সে.মি
প্রতি দুই বেডের মাঝখানের দূরত্ব = ৫০ সে. মি।

এতে চারার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে সুবিধা হয়। প্রতি দুই বেডের মাঝখানের মাটি তুলে নিয়ে বেডের উপর সমান করে দিতে হয়। এতে বেড উঁচু হয়। এরপর বীজ বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

ভিজা বীজতলা

এক্ষেত্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩ টি চাষ ও মই দেয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর আবার ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করতে হয়। ভিজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গজিয়ে নিয়ে বুনা ভাল। এক্ষেত্রেও বীজতলার মাপ শুকনা বীজতলার মতোই।

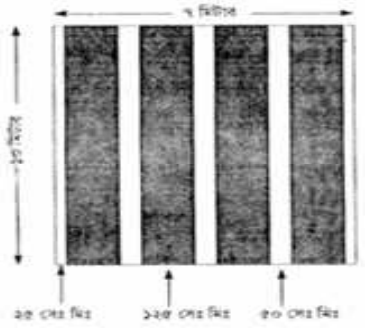

চিত্র : একটি আদর্শ বীজতলা

বীজতলার পরিচর্যা

নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়। আগাছা হলে তা তুলে ফেলতে হয়। রোগ ও পোকামাকড় আক্রমণ দেখা দিলে ব্লক সুপারভাইজার বা কৃষি কর্মকতার পরামর্শ নিয়ে তা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা উঠানো

জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। চারা তোলার পূর্বে বীজতলাতে পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেয়া ভালো। এতে চারা তুলতে সুবিধা হয়। চারা তোলার সময় যাতে গোড়া বা কান্ড ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চারা তোলার পর তা ছোট ছোট আঁটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।

সংরক্ষণ

বীজতলা থেকে চারা তোলার পর পর মূল জমিতে লাগানো সম্ভব না হলে চারার আঁটি ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে দিতে হয়।

জমি তৈরি

৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কাদাময় ও সমান করে নিতে হয়।

সার প্রয়োগ

ভালো ফলন পেতে চাইলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া উচ্চফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যো উপাদান গ্রহণ করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। গোবর বা আবর্জনা পচা জাতীয় জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

ইউরিয়া ব্যতীত সকল রাসায়নিক সার যেমন– টিএসপি, এমপি, জিপসাম, দস্তা প্রভৃতি জমিতে শেষ চাষ দেয়ার আগে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা রোপণ করার পর ৩ কিস্তিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। এবার দেখা যাক শতক প্রতি সারের পরিমাণ কি?

জাত ও মৌসুম ভেদে সারের মাত্রা (গ্রাম/শতক)

জাত	মৌসুম	সারের পরিমাণ (গ্রাম/শতক)				
		ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
নিজামী, নিয়ামত	বোনা আউশ	৫০০	৩০০	১৭০	২৫০	৪০
গাজী, ব্রিবালীম		৫৫০	৩৬০	১৬০	২৫০	৩৫
বিপ্লব, আশা, সুফলা	রোপা আউশ	৬০০	৩৬০	১৬০	২৫০	৩৫
কিরণ, দিশারী		৩৭০	৩৫০	১৫০	২৩০	৪০
প্রগতি, মুক্তা, ব্রিশাইল	রোপা আমন	৬০০	৩৭০	১৬০	২৬০	৫০
চান্দিনা, পূর্বাচী		৭৫০	৪২০	২৫০	২৭০	৪৫
ময়না, মোহিনী, শাহী বালাম	বোরো	৮৫০	৫২০	৩০০	২৯০	৪৫
শাহজালাল, মঙ্গল, হাসি		৫৮০	৩৭০	১৭০	২৬০	৫০

জাত ও মৌসুম ছাড়া সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যেমন

১। পাহাড়ের পাদভূমির মাটি ও লাল বেলে মাটিতে এমপি সার দেড়গুণ দিতে হয়।

২। গঙ্গাবাহিত পলিমাটি ও সেচ প্রকল্প এলাকার মাটিতে দস্তা সার বেশি পরিমাণে দিতে হয়।

৩। হাওড় এলাকার মাটিতে সার কম পরিমাণে দিতে হয়।

৪। স্থানীয় জাতের ধানে সারের পরিমাণ অর্ধেক দিলেই চলে।

৫। পূর্ববর্তী ফসলে প্রতিটি সার সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ হয়ে থাকলে উপস্থিত ফসলে প্রতিটি সারের অর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।

৬। পূর্ববর্তী ফসলে দস্তা সার ব্যবহার হয়ে থাকলে পরবর্তী ২টি ফসলে আর এ সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

৭। বেলে মাটিতে এম পি সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

৮। কোন জমিতে সবুজ সার ফসলের চাষ হলে পরবর্তী ফসলে ইউরিয়া সার ৪০-৫০% কমিয়ে ব্যবহার করলেও চলে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

সমান জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় চারা রোপণ করতে হয়। লম্বা রশির সাহায্যে সোজা সারি করে চারা রোপণ করা উত্তম। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০-২৫ সে.মি. এবং সারিতে গুছি থেকে গুছির দূরত্ব হবে ১৫-২০ সে.মি.। প্রতিটি গুছিতে ২-৩টি চারা দিতে হয়। দেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে লাগাতে হয়।

পরিচর্যা

- **সেচ :** জমি সমান হলে মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে এবং ঢালু হলে আইলবদ্ধ মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে হয়। দেশী জাতের ধানে পানি সেচ অবশ্যই প্রয়োজন। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ দিন পর্যন্ত ৩-৫ সে.মি. সেচ দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়। এরপর কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২-৩ সে.মি. এবং চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সে.মি. পরিমাণ পানি সেচ দেয়া উত্তম। থোড় আসার সময় পানি সেচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দানাপুষ্ট হতে শুরু করলে আর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

- **আগাছা দমন :** কমপক্ষে ৩ বার ধানের জমিতে আগাছা দমন করতে হয়।

(ক) চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে।
(খ) প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে।
(গ) থোড় বের হওয়ার আগ মুহূর্তে। ধান ক্ষেতে সাধারণত, আরাইল, গইচা প্রভৃতি আগাছার উপদ্রব হয়।

পোকা দমন

ধান ফসলে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ দেখা যায়। যেমন– সবুজ পাতা ফড়িং, মাজরা পোকা, পামরী পোকা, গান্ধী পোকা, গল মাছি, শীষ কাটা, লেদা পোকা ইত্যাদি। জমিতে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিলে সেখানে পাখি বসে এবং পোকা ধরে খায়। তাছাড়া প্রতিরোধী ফসলের জাত ও বিভিন্ন দমন পদ্ধতি দ্বারা পোকা দমন করা যায়। তবে দ্রুত দর্শনের ক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে একটি তালিকা দেয়া হলো :

পোকার নাম	**কীটনাশকের নাম**
গান্ধী পোকা, পামরী পোকা, গল মাছি, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা শোষক পোকা, চুঙ্গী পোকা	সুমিথিয়ন ৫০/ ম্যালাথিয়ন ৫৭/ এম এলটি ৫৭/রগড় ৪০
বাদামী গাছ ফড়িং	বাসুডিন ১০/ফুরাডান ৩/ ডায়াজিনন ১৪
শীষ কাটা লেদা পোকা	ভেপোনা ১০০

চিত্র : পামরী পোকা

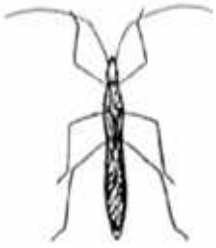
চিত্র : গান্ধী পোকা

চিত্র : সবুজ পাতা ফড়িং

চিত্র : মাজরা পোকা

- **রোগ দমন :** ধান ফসলে বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। যেমন– কান্ড পচা রোগ, টুংরো রোগ, বাদামী দাগ রোগ, উফরা রোগ, ব□াস্ট রোগ ইত্যাদি। এসব রোগ সঠিক সময়ে দমন করতে না পারলে ফলন যথেষ্ট কমে যায়। বীজ শোধন, আগাছা দমন ও সুষম সার প্রয়োগে বিভিন্ন

রোগ দমন হয়। এছাড়া প্রতিরোধী জাত যেমন– মালা ও গাজী জাতের ধানে বাদামী দাগ রোগ কম হয়। বিভিন্ন রোগনাশক যেমন– কুপ্রাভিট ৫০, হিনোসান ৫০ ইত্যাদি প্রয়োগ করে ও রোগ দমন করা যায়।

ধান ফসল কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ

শীষের উপরের অর্ধেক দানার শতকরা ৮০ ভাগ এবং নিচের অর্ধেক দানার শতকরা ২০ ভাগ শক্ত হলে ধান কাটার উপযুক্ত সময় হয়। তাছাড়া কিছু কিছু ধান সোনালী রং ধারণ করে এবং শীষের অগ্রভাগ হেলে পড়ে। এমতাবস্থায় ধান কেটে আঁটি বেঁধে পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে প্যাডেল থ্রেসার বা গরু দিয়ে বা পিটিয়ে মাড়াই করতে হয়। এরপর ঝেড়ে পরিষ্কার করে ৩-৪ বার ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

সারমর্ম

ধানের জমি সঠিকভাবে নির্বাচন করে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে সমান ও কাদাময় করে নিতে হয়। বীজতলা থেকে সারি পদ্ধতিতে রোপণ করতে হয়। এরপর সঠিক পরিমাণ সার প্রয়োগ, পানি সেচ, আগাছা দমন, পোকা ও রোগ দমন করে উপযুক্ত সময়ে ধান ফসল কেটে মাড়াই ও ঝাড়াই এর পর রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কালিজিরা ধান কী ধরনের জাত?

(ক) স্থানীয় (খ) স্থানীয় অনুমোদিত
(গ) উফশী (গ) কোনটিই নয়

২। কোন ওষুধ দ্বারা ধানের বীজ শোধন করা হয়?

(ক) সুমিথিয়ন (খ) ভিটাভ্যাক্স
(গ) এগ্রোসান জি. এন (ঘ) নগস

৩। একটি আদর্শ বীজতলার বেডের প্রস্থ কত?

(ক) ১০০সে.মি. (খ) ৭০ সে.মি.
(গ) ৫০ সে.মি. (ঘ) ১২৫ সে.মি.

৪। কতদিন বয়সের ধানের চারা রোপণ করা ভালো?

(ক) ৩০-২০ দিন (খ) ৬০-৭০ দিন
(গ) ১০-২০ দিন (ঘ) ৫০-৬০ দিন

পাঠ - ৪.২ : পাট চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পাট চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- পাটের জাত, বীজের পরিমাণ, বপনের সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- পাটের পোকামাকড়, রোগ ও এগুলোর দমন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পাট কাটা, পাতা ঝরানো, জাগ দেয়া, আঁশা ছাড়ানো ও ধোঁয়া এবং পাট শুকানোর প্রযুক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

পাট হলো একটি আঁশ ফসল। এদেশের অর্থকারী ফসলের মধ্যে পাট অন্যতম। আমরা পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি।

জমি নির্বাচন

উর্বর দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বেলে ও এঁটেল মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ করা যায়। যে জমিতে বর্ষার শেষের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য উত্তম। তোষা পাট উঁচু জমিতে এবং দেশী পাট উঁচু ও নিচু দু'ধরনের জমিতেই চাষ করা যায়।

পাটের জাত, বপণ সময় ও বীজহার

নিচে দেশী ও তোষা পাটের জাত, বপন সময় ও বীজহার ছকাকারে উলে- খ করা হলো :

জাত	**বপন সময়**	**বীজহার (কেজি/হেক্টর)**
দেশী পাট : সি.সি-৪৫, সি.ভি.ই-৩, সি.ভি.এল-১, ডি-১৫৪, এটম পাট-৩৮	১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	সারিতে ৫–৬ কেজি ছিটিয়ে ৭–৯ কেজি
তোষা পাট : 3-8, 3-৯৮৯৭ (ফাল্গুনী তোষা, সি. জি. (চিনসূরা হিন)	১৫ই এপ্রিল - ১৫ই মে	সারিতে ৩.৭৫–৫.০ কেজি ছিটিয়ে ৬–৮ কেজি

সঠিক সময়ের আগে বা পরে বীজ বুনলে আলোক সংবেদনশীলতার কারণে পাট গাছ সুষ্ঠুভাবে বাড়তে পারে না, অসময়ে ফুল দেখা দেয় এবং পাটের ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়।

জমি তৈরি

জমির জো অবস্থায় ৫-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয় এবং জমি থেকে আগাছা, পূর্ববর্তী ফসলের গোড়া, শিকড় ইত্যাদি বেছে পরিষ্কার করতে হয়।

সার প্রয়োগ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের (১৯৯২) সুপারিশ অনুযায়ী সার ব্যবস্থা মাত্রা নিম্নরূপ

সারের নাম	গোবর সার দিলে সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	গোবর সার না দিলে সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
গোবর	৩৭২০	০
ইউরিয়া	১২+১০০*	১০০+১০০*
টিএসপি	১৭	৫০
এমপি	২২	৯০
জিপসাম	০	৪৫
জিঙ্ক সালফেট	০	১০

* উপরি প্রয়োগে ব্যবহৃতব্য

গোবর সার প্রয়োগ করতে চাইলে বীজ বপনের ১৪-২১ দিন আগে গোবর জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। শেষ চাষের সময় ইউরিয়া সারের প্রথম অংশসহ অন্যান্য সব সার ছিটিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন করার ৬-৭ সপ্তাহ পর প্রতি হেক্টর জমিতে ১০০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর সময় ইউরিয়া দানা যেন কচি পাতায় লেগে না থাকে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এতে পাটের পাতা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনে উপরি প্রয়োগ করা কাম্য।

বীজ শোধন

বীজ বপন করার আগে শোধন করে নেয়া উত্তম। প্রতি কেজি পাট বীজের সাথে ২০ গ্রাম সেরিসান বা এগ্রোসান জি এন অথবা ২০ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ৫০% বা ক্যাপটান ৭৫% ওষুধ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেয়া উচিত। বীজ শোধনকারীর রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

বপন পদ্ধতি

সারিতে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়। সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি. এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৭-১০সে.মি। বীজ বেশি পরিমাণে বোনা হলে বীজ খরচ বেশি ছাড়াও জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলতে খরচ বেশি পড়ে। বেশি পাতলা হলে গাছে শাখা–প্রশাখা গজায়, ঘন হলে জীর্ণ শীর্ণ হয়, উত্তম আঁশ প্রাপ্তির জন্য কোনটাই কাম্য নয়।

পরিচর্যা

- **চারা পাতলাকরণ ও আগাছা দমন :** চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর একবার ঘন জায়গায় দূর্বল চারাগুলো তুলে ফেলা ও জমির আগাছা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এর ১৫ দিন পর আরও একবার চারা পাতলাকরণ ও আগাছা তুলে ফেলা আবশ্যক। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪,৪০,০০০ টি চারা থাকলে কাঙ্ক্ষিত ফলন আশা করা যায়।

- **পোকামাকড় দমন :** পাট ক্ষেতে বিছা পোকা, পাটের এপিওন, ঘোড়া পোকা, উড়চুঙ্গা, মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। কৃষি কর্মকর্তা, ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ অনুযায়ী এগুলো দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিত্র : বিছা পোকা

চিত্র : ঘোড়া পোকা

চিত্র : মাকড়

রোগ দমন : পাটগাছ ঢলে পড়া, কান্ড পচা, কালো পট্রি, শুকনো ক্ষেত, গোড়া পচা ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। এগুলো দমনের জন্য থানা কৃষি কর্মকর্তা বা ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ নিন।

পাট কাটা ও আঁটি বাঁধা

উন্নতমানের আঁশের জন্য গাছে ফুল ধরার সময় পাট কাটতে হয়। তবে এক্ষেত্রে ফলন কম হয়। ভালো ফলন ও আঁশ পাওয়ার জন্য ফুল থেকে ফল ধরার সময় পাট কাটার উত্তম সময়। বেশি মোটা করে আটি বাঁধলে পচতে বেশি সময় লাগে। এ জন্য ১৫-২০ সে.মি. ব্যাসের আঁটি বাঁধতে হয়।

পাতা ঝরানো ও গোড়া ডুবানো

পাট জাগ দেয়ার আগে পাতা ঝরিয়ে নেয়া উচিত। কারণ পচনকারী অণুজীব পাটের শক্ত কান্ডের চেয়ে নরম পাতা বেশি পছন্দ করে। এজন্য পাতা থাকলে পাট পচতে অসুবিধা হয়। আঁটি বাঁধার পর আটির অগ্রভাগকে অপর আঁটির গোড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয় এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সাজাতে হয়। ৪-৫ দিন পর আঁটিগুলো তুলে একটু ঝাঁকুনি দিলেই পাতা ঝরে পড়বে। পাট গাছের গোড়া মোটা ও শক্ত বিধায় মধ্য ও অগ্রভাগের তুলনায় দেরিতে পচে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য গোড়ার দিকটা ৩-৪ দিন পানির ভিতর রেখে আঁটিগুলো খাড়াভাবে স্তূপ করে রাখা হয়। এরপর জাগ দিলে পাটের আগা-গোড়ার একসাথে পচনক্রিয়া শুরু হয়।

জাগ দেওয়া

পাটকে পচানোর জন্য পাটের আঁটিগুলো সাজিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখাকে জাগ দেওয়া বলা হয়। কম স্রোতবিশিষ্ট পরিষ্কার পানিতে পাট জাগ দিতে হয়। বদ্ধ পানিতেও জাগ দেওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে প্রতি ১০০ আটির জন্য ১ কেজি ইউরিয়া সার জাগের উপর ছিটিয়ে দিতে হয়। এতে পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং আঁশের মান ভালো হয়। বেশি পরিমাণ লৌহযুক্ত পানিতে পাট জাগ দেওয়া উচিত নয়। এতে পাটের ট্যানিনের সাথে লৌহযুক্ত হয়ে পাটের আঁশের রং কালো করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে আঁশের গুণগতমান কমে যায়।

জাগের আকার বিভিন্ন রকম হতে পার। যেমন– পাটের আঁটির পোড়া মাথা একসাথে সাজিয়ে বেঁধে দিতে হয়। পরে দ্বিতীয় স্তরও একই নিয়মে সাজাতে ও বেঁধে দিতে হয়। জাগের উপর মাটি কলাগাছ, ঝিগাগাছ প্রভৃতি ব্যবহার করে জাগ ডুবানো বিজ্ঞানসম্মত নয়। এতে পাটের আঁশের রং কালো হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো জাগের দুই পার্শ্বে শক্ত খুঁটি পুতে জাগ ডুবানো। তবে কচুরিপানা, পাথর বা

কংক্রীটের চাকতিও ব্যবহার করা যেতে পারে। জাগ দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাগের উপরে কমপক্ষে ৩০ সে.মি. এবং নিচে কমপক্ষে ৬০ সে.মি. পানি থাকে।

পাট পচনের সমাপ্তি নির্ণয়

পাট পচনের মাত্রা এমন হওয়া উচিত যাতে আঁশগুলো একটির সাথে অন্যটি লেগে না থাকে। জাগ দেবার ১০-১১ দিন পর থেকেই পাটের পচন পরীক্ষা করে যেতে হবে। কৃষকরা সাধারণত জাগ থেকে ৪-৫ টি পাট গাছ টেনে বের করে ছাল ছাড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখে। তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো ২-৩ টি পাট গাছ জাগ থেকে বের করে তার মাঝখান থেকে ২.৫ সে. মি. পরিমাণ ছাল কেটে তা একটি পানি ভর্তি শিশির ভিতর নিয়ে ঝাঁকাতে হবে। পরে এই ছালগুলো পুনরায় পরিষ্কার পানি ভর্তি শিশির ভিতর নিয়ে ঝাঁকানোর পর যদি দেখা যায় যে আঁশগুলো ভালোভাবে পৃথক হয়ে গেছে তবে বুঝতে হবে পাটের পচন শেষ হয়েছে। সাধারণত পাট পচতে ১৫-২৫ দিন সময় লাগে।

আঁশ ছাড়ানো ও পরিষ্কারকরণ

পচার পর পাট গাছ থেকে দু'ভাবে আঁশ ছাড়ানো যায়, যথা–

- শুকনো জায়গায় বসে প্রতিটি পাট গাছ থেকে আলাদা আলাদাভাবে আঁশ ছাড়িয়ে নেয়ার পর কায়েকটি পাট গাছের আঁশ একত্রে করে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং আঁটি বেঁধে রাখা হয়। এক্ষেত্রে পাটের কাঠি ভাঙ্গা হয় না বিধায় আস্ত থাকে।
- হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের আঁটির গোড়ায় কাঠ বা বাঁশের মুগুর দ্বারা পিটানো হয়। এরপর গোড়া থেকে ৪০-৪৬ সে.মি. দূরে ভেঙ্গে পানির মধ্যে লম্বভাবে কয়েকটি ঝাঁকি দিলেই গোড়ার পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরে গোড়ার আঁশ হাতে পেচিয়ে নিয়ে পানির উপর সমান্তরালভাবে সামনে পিছনে ঠেলা দিলেই অগ্রভাগের পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে আঁশগুলো ভালোভাবে ধূয়ে নিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা হয়।

আঁশ শুকানো ও সংরক্ষণ

প্রখর সূর্যালোকে বাঁশের আড় তৈরি করে তাতে পাটের আঁশ শুকানো হয়। আঁশ বেশি শুকালে তা ভঙ্গুর হয় এবং কম শুকালে ভিজা থাকে বিধায় পচনক্রিয়া শুরু হয়। এতে আঁশের গুনগত মান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে পাটের আঁশ শুকিয়ে নেয়ার পর সুন্দর করে বেঁধে গুদামে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাতভেদে ফলনের তারতম্য হয়। তোষা পাটের তুলনায় দেশী পাটের ফলন সামান্য বেশি হয়। দেশী পাটের ফলন প্রতি হেক্টরে ৪.৫-৫.৫ টন এবং তোষা পাটের ফলন ৪-৫ টন পর্যন্ত হয়।

সারমর্ম

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাট অন্যতম। এদেশের মাটি, জলবায়ু ও পরিবেশ পাট চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। উর্বর দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য উত্তম। জো অবস্থায় ৫-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে পাটের জমি তৈরি করতে হয়। জমি তৈরির শেষচাষের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইউরিয়াসহ সকল সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ফুল থেকে ফল ধরার সময় পাট কাটলে ভালো আঁশ ও ফলন পাওয়া যায়।এছাড়া পাতা ঝরানো, জাগ দেওয়া আঁশ ছাড়ানো ও শুকানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন্ মাটি পাট চাষের জন্য উত্তম?

(ক) এঁটেল (খ) দোঁআশ
(গ) বেলে (ঘ) পলি

২। কোন্টি দেশী পাটের জাত?

(ক) এটম পাট-৩৮ (খ) ও-৮
(গ) ও-৯৮৯৭ (ঘ) সি. জি.

৩। প্রতি হেক্টর জমিতে কাঙ্ক্ষিত পাট গাছের সংখ্যা কত?

(ক) ৩,০০০০০ টি (খ) ৫, ৫০,০০০ টি
(গ) ৪, ৪০,০০০ টি (ঘ) ২,০০০০০ টি

৪। জাগ ডুবানোর ক্ষেত্রে কোন্টি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি?

(ক) মাটি দিয়ে জাগ ডুবানো (খ) কলাগাছ দিয়ে জাগ ডুবানো
(গ) কচুরিপানা দিয়ে জাগ ডুবানো (ঘ) খুঁটি পুঁতে জাগ ডুবানো

৫। পচনের পর পাট থেকে কয়ভাবে আঁশ ছাড়ানো যায় ?

(ক) দুইভাবে (খ) তিনভাবে
(গ) চারভাবে (ঘ) একভাবে।

পাঠ-৪.৩ : আলু চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- আলু চাষের জমি নির্বাচন ও তৈরি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- আলুর চাষাবাদ সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আলু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সবজির মধ্যে আলুই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদেশের প্রায় সব জায়গাতেই আলুর চাষ হয়। জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের দিক থেকে এদেশে ধান ও গমের পরেই আলুর স্থান। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে আলুর ফলন ধান ও গমের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগিজরা আমাদের দেশে আলু নিয়ে এসেছিল বলে ধারণা করা হয়।

জলবায়ু

শুষ্ক ও স্বাভাবিক ঠান্ডা আবহাওয়া আলু চাষের জন্য উত্তম। তাপমাত্রা ১০$^{\circ}$ সে. থেকে ২০$^{\circ}$ সে. এর ভিতরে থাকলে আলুর ফলন ভালো হয়। এর নিচে বা উপরে গেলে ফলন কমে যায়। তবে ১৫-২০$^{\circ}$ সে. তাপমাত্রায় ফলন সবচেয়ে বেশি হয়।

জমি নির্বাচন

বৃষ্টির পানি জমে থাকে না বা পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এমন ধরনের দো-আঁশ বা বেলে-দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য উপযোগী।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) আলুর অনেকগুলো উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।এই জাতগুলো হলো– কুফরী, সিন্দুরী, কার্ডিনাল, মোরিন, মাল্টা, হীরা, ওরিগো ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু দেশী জাত যেমন– শীলবিলাতী, দোহাজারী, চল্লিশা, লালপাকরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ আলুর প্রকৃত বীজ (TPS) উৎপাদন করতে সফল হয়েছেন। এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে এবং আলুচাষীরা লাভবান হতে পারবেন।

রোপণ সময়

বেশি বৃষ্টি না হলে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসেই আলুর কন্দ রোপণ করা যায়। তবে নভেম্বর মাসেই সাধারণত রোপণ করা হয়ে থাকে। নভেম্বর মাসের পর রোপণ করতে যত দেরি হবে ফলন তত কমে যাবে।

জমি তৈরি

গভীরভাবে ৬-৭ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়।

রোপণ পদ্ধতি

কন্দের ক্ষেত্রে – দুই পদ্ধতিতে আলুর চাষ করা যায়।

১। আচ্ছাদন পদ্ধতি ও

২। ভেলী পদ্ধতি।

এখন দেখা যাক পদ্ধতি দুটো কী?

আচ্ছাদন পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে আলুর কন্দ লাগানোর পর খড়-কুটা, কচুরীপানা ইত্যাদি দিয়ে জমি ঢেকে দেয়া হয় এবং কোন প্রকার পানি সেচ দেওয়া হয় না।

ভেলী পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে আলুর কন্দ জমিতে সারি করে লাগানো হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব সাধারণত: ৫০-৬০ সে.মি. এবং সারিতে কন্দ থেকে কন্দের দূরত্ব ২০-২৫ সে.মি. রাখা হয়। পরে কন্দ থেকে চারা মাটির উপর ৩-৪ সে.মি. বের হবার পর সারির দুপাশের মাটি তুলে নিয়ে চারার গোড়ায় স্থাপন করতে হয়। এতে প্রতিটি সারি দুপাশের ফাঁকা জায়গা থেকে বেশ উঁচু হয় এবং দু'সারির মাঝখানে নালা সৃষ্টি হওয়াতে প্রয়োজনে সেচ দেওয়া যায় বা প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করা যায়।

প্রকৃত বীজের ক্ষেত্রে– এখানেও দু'ভাবে আলু চাষ করা যায়।

১। বীজতলায় আলুর প্রকৃত বীজ বুনে চারা তৈরি করে সেই চারা মূল জমিতে লাগানো হয়।

২। জমিতে বীজ বুনে প্রথম বছরে ছোট ছোট কন্দ উৎপাদন করে তা হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। পরের বছর এই কন্দ লাগিয়ে আলুর চাষ করা হয়।

বীজের পরিমাণ

প্রতি হেক্টর আলুর কন্দ প্রয়োজন ১.৭ - ২.৪ টন এবং প্রকৃত বীজ লাগবে ৩০০-৩৫০ গ্রাম। উল্লেখ্য আলু চাষে যে মোট ব্যয় হয় তার ৩০-৪০% ব্যয় হয় আলুর কন্দ কিনতে।

সার প্রয়োগ

প্রতি হেক্টর জমিতে আলু চাষ করলে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

জৈব সার/ গোবর	-	১০ টন
ইউরিয়া	-	৩২৫ কেজি
টি এস পি	-	২৩০ কেজি
এমপি	-	২৭৫ কেজি

উপরোক্ত সারগুলো ছাড়াও যে সব জমিতে সালফার ও দস্তার অভাব ধরা পড়ে সেখানে ৪০-৪৫ কেজি জিপসাম এবং ৮-১০ কেজি জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আচ্ছাদন পদ্ধতিতে আলু চাষ করলে সব সার চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আবার ভেলী পদ্ধতিতে চাষ করলে সম্পূর্ণ জৈব সার/ গোবর, টি এস পি, জিপসাম ও জিংক সালফেট চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এম পি সারের অর্ধেকটা জমি তৈরির সময় ও বাকি অর্ধেকটা ভেলীতে প্রয়োগ করতে হয়। আর ইউরিয়া সারের $^{১}/_{৩}$ অংশ চাষের সময় $^{১}/_{৩}$ অংশ চারা বের হওয়ার ১৫-২০ দিন পর এবং

বাকি $^{১}/_{৩}$ অংশ চারা বের হওয়ার ৪০-৪৫ দিন পর গাছের গোড়ায় ভেলী বরাবর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এসময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে রোপণকৃত কন্দ বা চারার গায়ে কোন আঘাত না লাগে বা ক্ষতের সৃষ্টি না হয়।

পরিচর্যা

- **আচ্ছাদন পদ্ধতির বেলায় :** জমির কিছু কিছু জায়গায় নতুন করে খড়–কুটা বা কচুরিপানা বিছায়ে দিতে হয়। আবার ভেলী পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভেলীতে মাটি তুলে দিতে হয়।
- **সেচ ও নিকাশ :** শুষ্ক মৌসুমে আলু চাষ করা হয় বিধায় ২-৩ বার সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে জমিতে পানি জমে গেলে তা নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **পোকাদমন :** আলু গাছে কাটুই পোকা, জাব পোকা প্রভৃতির আক্রমণ দেখা যায়। কাটুই পোকা রাতের বেলা গাছের গোড়া কেটে দিয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতিদিন ভোরবেলা কাটা গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া ১ লিটার পানির সঙ্গে ১.৫ - ২.০ মিলিলিটার জার্সবান ওষুধ মিশিয়ে সারির মাঝখানে স্প্রে করে দিয়ে হালকা সেচ দিলে এ পোকা দমন হয়। জাব পোকা আলু গাছের পাতা ও কচি ডগার রস চুষে খায়। এতে গাছের বৃদ্ধি কমে যাওয়াতে ফলন কম হয়। এ পোকা দমনের জন্য নুভাক্রন/সুমিথিয়ন/নগস পানির সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- **রোগ দমন :** আলুর অনেক রোগ আছে তবে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হলো লেটব্লাইট বা নাবি ধবসা। এই রোগ এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে। ঠান্ডা,আর্দ্র ও মেঘলা আবাহাওয়াতে দেখা দেয়ার সাথে সাথেই ডাইথেন এম -৪৫ বা রিডোমিল পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল উত্তোলন

উন্নত জাতসমূহ পরিপক্ব হতে সাধারণত ৯০-১১০ দিন সময় নেয়। কিন্তু দেশী জাতের আলু পরিপক্ব হতে এর চেয়ে বেশি সময় লাগে। পরিণত বয়সে আলু গাছ হেলে পড়ে ও পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। আলু জমি থেকে তোলার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে আলু কেটে বা থেতলে না যায় এবং কোন প্রকার ক্ষত সৃষ্টি না হয়। আলু তোলার পর প্রচুর বাতাসযুক্ত জায়গায় ও ছায়াময় স্থানে কমপক্ষে ২-৩ ঘন্টা রাখতে হয়। এরপর পচা, কাটা, থেতলানো ছোট, মাঝারি, বড় প্রভৃতিভাবে আলু বাছাই করে নিতে হয়। অবশ্যই মেঘমুক্ত পরিষ্কার দিনে আলু উত্তোলন করা উচিত।

সংরক্ষণ

আলু বেশিদিন সংরক্ষণ করতে চাইলে হিমাগারে রাখা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তবে সাধারণভাবে সংরক্ষণ করতে চাইলে প্রচুর আলো বাতাস চলাচল করে এমন ঠান্ডা গুদামে বা ঘরে রাখতে হবে। ঘরে মাচা তৈরি করে তার উপর চাটাই বিছাতে হয়। এই চাটাই এর উপর ৩.৫-৫.০ সে.মি. পরিমাণ পরিষ্কার ও শুকনো বালি বিছিয়ে এর উপর ১৬-২০ সে.মি. পুরু করে আলু রাখতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে চালাতে হয়। উল্লেখ্য ১৫-২০ দিন পর পর

গুদামের আলু পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং পচা আলু পাওয়া গেলে তা সরিয়ে ফেলতে হয়।

ফলন

উন্নত জাত : ১৪ - ৩৫ টন / হেক্টর

দেশী জাত : ৮ - ১৫ টন / হেক্টর

সারমর্ম

শুষ্ক ও ঠান্ডা আবহাওয়া আলু চাষের উপযোগী। ১৫-২০° সে. তাপমাত্রায় আলুর ফলন সবচেয়ে বেশি হয়। উর্বর দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য উত্তম। আলুর উফশী জাত হলো কার্ডিনাল, কুফরী, সিন্দুরী, মাল্টা, মেরিন, হীরা প্রভৃতি। দেশীজাত হলো– লালপাকরী, শিলবিলাতী দোহাজারী ইত্যাদি। নভেম্বরের পর আলু লাগাতে যত বিলম্ব হবে ফলন তত কম হবে। প্রকৃত বীজ বা কন্দ থেকে আলু দু'ভাবে উৎপাদন করা হয়। আলুর সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা হলো কাটুই পোকা এবং রোগ হলো লেটব্লাইট। প্রতি হেক্টরে আলুর ফলন ৮- ৩৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ– ৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কত তাপমাত্রায় আলুর ফলন সবচেয়ে ভালো হয়?

(ক) ৫-৭° সে. (খ) ১০ - ১৪° সে.

(গ) ১৫ - ২০° সে (ঘ) ২৫ - ৩০° সে.

২। কোন্‌টি আলুর দেশী জাত?

(ক) সিন্দুরী (খ) লালপাকরী

(গ) কার্ডিনাল (ঘ) হীরা

৩। প্রকৃত বীজ বা কন্দ থেকে কয় পদ্ধতিতে আলু চাষ করা যায় ?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

৪। কোন্‌টি আলুর ক্ষতিকর পোকা?

(ক) পামরী পোকা (খ) গান্ধী পোক

(গ) সবুজ ঘাস ফড়িং (ঘ) কাটুই পোকা

৫। কাটুই পোকা আলু গাছ কখন কেটে দেয়?

(ক) সকাল বেলায় (খ) দুপুর বেলায়

(গ) বিকেল বেলায় (ঘ) রাতের বেলায়

পাঠ - ৪.৪ : সরিষা চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সরিষা চাষের গুরুত্ব জমি নির্বাচন ও তৈরি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- সরিষার জাত, বপন সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সরিষা চাষের প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে তৈল ফসল হিসেবে সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তবে এদেশের মানুষ সরিষাকেই তৈল ফসল হিসেবে বেশি চাষ করে থাকে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষ সরিষার তৈল মাথায় ও গায়ে মাখাতে অভ্যস্ত। এছাড়া রান্নার কাজে ও সর্দি-কাশি হলে নাকে–মুখে ব্যবহার করে। কিন্ড্রু এ তেলের অন্য একটি দিক হলো– এতে ৪০ - ৪৫% ক্ষতিকর ইরোসিক এসিড থাকে যা হৃদপিন্ডে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। তবে আশার কথা আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ সরিষার তৈল খেয়ে থাকি তাতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খৈল থাকে তাতে প্রায় ৩৫% প্রোটিন এবং ৬.৪% নাইট্রোজেন থাকে। এ জন্য খৈল গৃহপালিত পশুর ভালো খাবারও বটে। খৈলে নাইট্রোজেন থাকায় ভালো জৈব সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরিষার জমিতে কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত অল্প খরচে মৌমাছি পালন করে বেশ মধু সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য সরিষাকে মধু উদ্ভিদ বলা হয়। উপরন্তু মৌমাছি থাকাতে সরিষার পরাগায়ন ভালোভাবে হয় বিধায় সরিষার ফলনও বেশি হয়।

জমি নির্বাচন

পানি নিকাশের সুব্যবস্থা আছে এমন বেলে দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমি সরিষা চাষের জন্য উপযোগী।

জাত, বপন সময় ও বীজ হার

সরিষার স্থানীয় ও উফশী দু'ধরনের জাত রয়েছে। নিম্নে এদের কয়েকটির নাম, বপন সময়, বীজ হার ও জীবনকাল একটি তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

জাত	জাতের নাম	বপন সময়	বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)
উফশী	কল্যাণী	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৮	৭৫-৮৫
	সোনালী	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৮.৫	৯০-১০৫
	সম্পদ	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৯	৯০-১২০
	সম্বল	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৭.৫	৯৫-১১০
স্থানীয়	রাই-৫	মধ্য অক্টোবর - নভেম্বরেরশেষ	৭.৫	৯০-১০৫
	মাঘী	মধ্য অক্টোবর - নভেম্বরের শেষ	৮	৭০-৮০

বীজ শোধন

প্রতি কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ভিটাভ্যাক্স ২০০ বা ক্যাপটান দিয়ে শোধন করে নিয়ে বুনতে হয়।

জমি তৈরি

মাটির জো অবস্থায় আড়াআড়ি ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। উল্লেখ্য যে সরিষার বীজ ছোট বিধায় মাটি অবশ্যই মিহি করতে হবে যাতে বীজ সহজেই মাটির সংস্পর্শে আসতে পারে। জমির উপরিভাগ মই এর সাহায্যে সমতল করে নিতে হবে যেন কোথাও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে না পারে।

সার প্রয়োগ

সরিষার জাত ও মাটি ভেদে সারের পরিমাণের পার্থক্য হয়ে থাকে। নিম্নে সাধারণ একটি হিসেব উপস্থাপন করা হলো :

সারের নাম	**সারের পরিমাণ/হেক্টর**
কম্পোস্ট / খামারজাত সার	৭-৮ টন
ইউরিয়া	২০০ - ২৫০ কেজি
টি এস পি	১৫০ - ১৮০ কেজি
এম পি	৭৫ - ৮৫ কেজি

উল্লেখ্য ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ বাকি সব সার জমি প্রস্তুত করার সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ফুল আসার সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। কোন জমিতে সালফার, দস্তা ও বোরনের অভাব পরিলক্ষিত হলে স্থানীয় কৃষি কর্মীর পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জিপসাম, জিংক সালফেট ও সোহাগা (বরিক এসিড) উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সার প্রয়োগ করার পর জমিতে সেচ দিলে সরিষার ফলন আরও বৃদ্ধি পাবে। গাছে শিশির শুকিয়ে গেলে অর্থাৎ পড়ন্ত বিকেলে উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

বপন পদ্ধতি

সরিষার বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়।বীজ ছোট বিধায় বোনার সময় জমিতে সমানভাবে ছিটানো কষ্টকর হয়। এজন্য বালি বা ছাই এর যে কোন একটি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ ছিটালে জমিতে সমভাবে পড়ে। এতে জমির কোন জায়গায় গাছ ঘন আবার কোন জায়গায় পাতলা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। লাইন করেও সরিষার বীজ বোনা যায়। এতে সার, সেচ, নিড়ানি প্রভৃতি পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব সাধারণত ২৫-৩০ সে.মি. রাখা হয় এবং প্রতি লাইনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।

পরিচর্যা

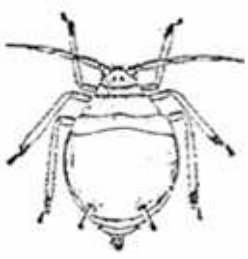

চিত্র : জাব পোকা

রোগ ও পরগাছা দমন : সরিষা গাছে পাতায় দাগ পড়া বা অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ হয়। এ রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে পাতায় বাদামী বা গাঢ় বাদামী দাগ পড়ে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পাতা, কান্ড, শুঁটি ও বীজেও এই দাগ পড়ে।

এ রোগ দমনের জন্য ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা রোভরাল ডব্লিউপি ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১২ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে। এছাড়া সরিষা ক্ষেতে অরোবাংকি নামক এক প্রকার পরগাছা জন্মে যা সরিষার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। অরোবাংকি দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিড়ানি দিয়ে জমি থেকে উঠিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

ফসল কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই

কোন্ জাতের সরিষা কতদিন পর সংগ্রহ করতে হবে তার একটি হিসেব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া সরিষা গাছে শতকরা ৮০ - ৮৫ ভাগ গাছ হলদে হলে পরিষ্কার দিনে সকাল বেলা গাছ কেটে নিয়ে মাড়াই করার স্থানে নিয়ে যেতে হয়। এখানে প্রখর সূর্যালোকে ২-৩ দিন শুকানোর পর বিকেলের দিকে গরু দ্বারা মাড়াই করতে হয়। এরপর সরিষার বীজ আলাদা করে কুলা ও চালুনি ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হয়।

বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ

পরিষ্কার বীজ রোদে ৩-৪ দিন ভালোভাবে শুকিয়ে (আর্দ্রতা ৫-৬%) নিতে হয়। এই বীজ শীতল পরিবেশ ও আর্দ্রতা কম এমন স্থানে শুকনো পরিষ্কার যে কোন পাত্রে ১-২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ফলন

উফশী জাত : ১৫০০ - ২০০০ কেজি / হেক্টর

স্থানীয় জাত : ৯৫০ - ১১০০ কেজি / হেক্টর

সারমর্ম

সরিষা এদেশের বিভিন্ন তৈল জাতীয় ফসলের মধ্যে অন্যতম। সরিষার বীজ থেকে তৈল ও খৈল পাওয়া যায়। তৈলে ক্ষতিকর ইরোসিক এসিড বিদ্যমান। আর খৈল ভালো জৈব সার ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুনিষ্কাশিত বেলে দো-আঁশ মাটি সরিষা চাষের জন্য উপযুক্ত। সরিষা বীজ প্রধানত মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ড় বোনা যায়। সরিষা ফসলের ক্ষতিকর পোকা, পরগাছা ও রোগ হলো– যথাক্রমে জাব পোকা, অরোবাংকি এবং পাতায় দাগ পড়া রোগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সরিষার তৈলে কোন্ এসিড বিদ্যমান?
(ক) ইরোসিক এসিড (খ) সালফিউরিক এসিড
(গ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড (ঘ) টারটারিক এসিড

২। কোন্ মাটি সরিষা চাষের জন্য উত্তম?
(ক) এঁটেল (খ) বেলে
(গ) দো–আঁশ (ঘ) বেলে দো–আঁশ

৩। কোন উদ্ভিদকে মধু উদ্ভিদ বলা হয়?
(ক) সয়াবিন (খ) সরিষা
(গ) তিল (ঘ) তিসি

৪। কোন্ পোকা সরিষা ফসলের প্রধান শত্রু?
(ক) লেডিবার্ড বিটল (খ) ড্যামসেল ফ্লাই
(গ) জাব পোকা (ঘ) কাটুই পোকা

৫। শতকরা কত ভাগ শুটি পাকলে সরিষা ফসল কাটতে হয়?
(ক) ৪০ - ৫০ (খ) ৫০ - ৬০
(গ) ৯৫ - ১০০ (ঘ) ৮০ - ৮৫।

পাঠ- ৪.৫ : ডাল চাষ (মসুর)

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ডাল চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মসুর ডাল চাষের জমি নির্বাচন ও তৈরির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- মসুর ডালের জাত, বপন সময় ও পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- মসুর ডাল চাষাবাদের প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ডাল ফসল যেমন– খেসারি, মসুর, ছোলা, মাসকলাই, মুগ, মটর, অড়হর, সিম প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। একজন মানুষের প্রতিদিন গড়ে ২৩০০ কিলোক্যালরী শক্তি প্রয়োজন। আর এই শক্তি আসে প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে। উদ্ভিজ্জ খাবারের মধ্যে ডাল অন্যতম। শক্তির উৎস আমিষ প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ দু'ধরনেরই হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাণিজ আমিষ যেমন– মাংস, মাছ, ডিম প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে বলে তারা কিনতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদজাত আমিষ যেমন– ডাল সস্তা সাধারণ বিধায় মানুষ সহজেই কিনতে পারে এবং ডাল তারা খেতেও ভালোবাসে। এই ডালে উলে-খযোগ্য পরিমাণ আমিষ থাকে। ফলে সাধারণ মানুষ ডাল খেয়ে আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করতে পারে বলে ডালকে গরিবের মাংস বলা হয়। ডালে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড লাইসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে কিন্তু সিস্টিন ও মেথিওনিন এর ঘাটতি থাকে। অপরদিকে চাউলে সিস্টিন ও মেথিওনিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, কিন্তু লাইসিনের ঘাটতি থাকে। ফলে পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে ডাল-ভাত বা ডাল-রুটি খাদ্য হিসেবে উত্তম। ডাল ফসল কোন জমিতে চাষ করলে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব সার ও নাইট্রোজেন যোগ হয়। এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ডাল ফসলের ভুষি গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য। এ পাঠে আমরা শুধু মসুর ডালের চাষাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

জমি নির্বাচন

পানি জমে থাকে না এমন ধরনের সু-নিষ্কাশিত বেলে দো–আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমি মসুর ডাল চাষের জন্য উত্তম।

জাত

বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্থানীয় জাত আছে। তবে অনুমোদিত জাত হলো–উৎফলা (এল-৫)। এছাড়াও বাংলাদেশে আবাদকৃত উল্লেখযোগ্য জাত হচ্ছে– মুকদিয়া-১৫, জামালপুর-২, জামালপুর-৬ প্রভৃতি।এদের জীবন কাল ৯০-১০০ দিন এবং হেক্টর প্রতি ফলন ১০০০-১৩০০ কেজি।

বপন সময়

মসুর বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত।

জমি তৈরি

মাটির জো অবস্থায় ৩-৪ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে ও মিহি করে জমি তৈরি করতে হবে। বর্ষার শেষে পানি চলে যাবার পর পলি মাটিতে বিনা চাষেও মসুরের বীজ

ছিটানো যায়। জমি তৈরির সময় পানি নিকাশের জন্য অবশ্যই নালা তৈরি করতে হবে। কারণ মসুর গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

সার প্রয়োগ

পূর্ববর্তী ফসল, মাটি, জাত প্রভৃতি বিবেচনা সাপেক্ষে সারের পরিমাণ কম–বেশি হতে পারে। তবে সাধারণ একটি হিসেব নিচে উল্লেখ করা হলো :

ইউরিয়া : ৮০ কেজি / হেক্টর
টিএসপি : ২৫০ কেজি / হেক্টর
এমপি : ৬২ কেজি / হেক্টর

উপরোক্ত এসব সার শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার প্রয়োগ করলে ইউরিয়া সার ব্যবহার না করলেও চলে। এ ছাড়া জমিতে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদনকারী ব্যকটেরিয়া কম থাকলে প্রতি কেজি মসুর বীজ ৭০ গ্রাম জীবাণু সার (ইনোকুলাম) দিয়ে শোধন করার পর বপন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বীজের পরিমাণ

ছিটিয়ে : ৩৬ - ৪০ কেজি / হেক্টর

সারিতে : ৩০ - ৩৫ কেজি / হেক্টর

বপন পদ্ধতি

ছিটিয়ে বা সারিতে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যায়। তবে ফলনের কোন পার্থক্য হয় না। এজন্য সাধারণত ছিটিয়েই মসুর বীজ বপন করা হয়। তবে সারিতে বুনতে চাইলে সেক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫- ৩০ সে.মি. রাখা হয়।

পরিচর্যা

- **আগাছা দমন :** মসুর চারা বের হওয়ার ২৫-৩০ দিনের মধ্যেই নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এসময় জমির কোথাও ঘন চারা থাকলে তা পাতলা করে দিতে হবে।
- **সেচ ও নিকাশ :** মসুর ফসলে সাধারণত সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে মাটিতে রসের পরিমাণ কমে গেলে একবার সেচ দেয়া যেতে পারে। কোন কারণে পানি জমে গেলে তা অবশ্যই নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **পোকা দমন :** মসুর ফসলে অনেক পোকাই দেখা যায়। তবে জাব পোকা বেশি ক্ষতি করে। এরা পাতা, কুঁড়ি ও ফল থেকে রস চুষে খেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে। এদের দমনের জন্য সুমিথিয়ন বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি স্প্রে করতে হবে।
- **রোগ দমন :** মসুর ফসলে মরিচা পড়া, নেতিয়ে পড়া, শিকড় পচা প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। এগুলো দমনের জন্য বীজ বোনার আগে ভিটাভ্যাক্স-৪০০ ওষুধ দ্বারা শোধন করে নিতে হবে।

ফসল কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও সংরক্ষণ

বীজ বপন করার ৯০-১০০ দিনের মধ্যেই মসুর ডাল পেকে যায়। এছাড়া গাছের ৮০ - ৮৫% শুঁটি বা ফল পেকে গেলেই ফসল কাটতে হয়। পরিষ্কার দিনে মসুর ফসল কেটে মাড়াই করার স্থানে আনতে হয়। এখানে রৌদ্রে শুকানোর পর গরু দ্বারা মাড়াই করা হয়। এরপর কুলা ও চালুনি দ্বারা মসুর দানা পৃথক করে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং ২-৩ দিন প্রখর রৌদ্রে ভালোভাবে শুকাতে হয়। এই শুকনো বীজ টিন, ড্রাম বা মাটির পাত্রে এমনভাবে রাখতে হয় যাতে বায়ু বা পোকামাকড় ঢুকতে না পারে। মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা। এরূপ হলে মাঝে মাঝে রৌদ্রে শুকিয়ে পূর্বের ন্যায় আবার সংরক্ষণ করতে হবে। গুদামজাতকরণের জন্য বীজের আর্দ্রতা ১০-১২% এর মধ্যে হলে পোকা ও ছত্রাকের আক্রমণের এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বিনষ্টের ভয় কম।

ফলন

প্রতি হেক্টরে ১.৫ - ২.০ টন পর্যন্ত মসুর দানা পাওয়া যায়।

সারমর্ম

ডালকে গরিবের মাংস বলা হয়। ডাল ফসলের ভুষি গবাদিপশুর উত্তম খাবার। এ ফসলের শিকড়ে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে গুটি সৃষ্টি করে। এজন্য ডাল ফসল চাষ করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মসুর ডাল বেলে দো-আঁশ বা এটেল দো–আঁশ মাটিতে ভালো হয়। এ ডাল জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। উৎফলা মসুর ডালের একটি উফশী জাত। মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর মসুর বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। বীজ বোনার আগে ভিটাভ্যাক্স দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। প্রতি হেক্টরে ১.৫ - ২.০ টন মসুর দানা পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন সময় মসুর বীজ বপন করতে হয়?

(ক) মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর (খ) মধ্য জানুয়ারি - মধ্য ফেব্রুয়ারি
(গ) মধ্য মার্চ - মধ্য এপ্রিল (ঘ) মধ্য মে - মধ্য জুন

২। কোন্‌টি মসুর ডালের জাত?

(ক) কুফরী (খ) নীলা
(গ) উৎফলা (ঘ) লালপাকরী

৩। বীজ বপন করার পর কত দিনের মধ্যে মসুর ফসল পরিপক্ব হয়?

(ক) ৫০ - ৬০ দিন (খ) ৯০ - ১০০ দিন
(গ) ৭০ - ৮০ দিন (ঘ) ৬০ - ৭০ দিন

৪। প্রতি হেক্টর মসুরের ফলন কত হতে পারে?

(ক) ৫- ৬ টন (খ) ৪ - ৫ টন
(গ) ৩ - ৪ টন (ঘ) ১.৫ - ২.০ টন

ব্যবহারিক

বিষয় - ১ : ধানের শুকনো বীজতলা তৈরি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- বীজ
- জমি
- লাঙ্গল
- মই
- কোদাল
- মুগুর

কাজের ধারা

১। ছায়া পড়ে না ও বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এমন দো–আঁশ মাটি সম্পন্ন উঁচু জমি নির্বাচন করুন।

২। জমির জো অবস্থায় ৪-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে, নরম ও সমান করে তৈরি করুন।

৩। উর্বর মাটি হলে সার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তবে উর্বর কম হলে সেক্ষেত্রে পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি হারে চাষের সময় প্রয়োগ করুন।

৪। সেচ, নিকাশ ও পরিচর্যার সুবিধের জন্য ১২৫ সে.মি. চওড়া যে কোন দৈর্ঘ্যের বেড বা জমি খন্ড চিহ্নিত করুন।

৫। দুটো বেডের মাঝে ৫০ সে.মি. এবং বেড ও জমির আইলের মাঝে ২৫ সে.মি. জায়গা ফাঁকা রাখুন।

৬। এবার এই ফাঁকা জায়াগাগুলো থেকে গভীরভাবে ১০ - ১৫ সে.মি. মাটি তুলে বেডের উপর দিন। এতে ফাঁকা জায়গাগুলোতে সেচ বা নিকাশের জন্য নালা সৃষ্টি হবে।

৭। এখন বেডের মাটি সমান করার পর প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য ৭৫ - ৮৫ গ্রাম হারে শুকনো বীজ ভালোভাবে ছিটিয়ে দিন এবং মাটি নাড়াচাড়া করে বীজ ঢেকে দিন। এই অবস্থায় নালাগুলো পানি দ্বারা ভর্তি করে রাখুন।

৮। বেডে বা বীজতলায় চারা গজানোর পর আগাছা জন্মালে নিড়ানি দিয়ে তা পরিষ্কার করে দিন।

৯। পোকামাকড় ও রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে কৃষিকর্মীর পরামর্শ মোতাবেক তা দমনের ব্যবস্থা নিন।

১০। ধানের চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ - ১০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিন।

১১। ধানের চারা উঠানোর আগে বীজতলার মাটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন। এতে মাটি নরম হওয়াতে চারা সহজে উঠে আসবে। এসময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে পাতা বা কান্ড ছিড়ে বা ভেঙ্গে না যায়।

১২। এবার ধানের শুকনো বীজতলা তৈরির কাজটি অনুশীলন করুন এবং বীজতলা তৈরি থেকে শুরু করে চারা উঠানো পর্যন্ত কার্যধারা আপনার ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

বিষয় - ২ : ধানের ভিজা বীজতলা তৈরি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

বীজ, জমি, লাঙ্গল, মই, কোদাল।

কাজের ধারা

১। সারাদিন রোদ পায় ও বর্ষার পানিতে ডুবে যায় না এমন এঁটেল মাটি সম্পন্ন উঁচু জমি নির্বাচন করুন।

২। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিয়ে নির্বাচিত জমি ৩- ৪ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করে ৬ -৭ দিন ফেলে রাখুন। এতে সব আগাছা পচে গিয়ে সারে পরিণত হবে।
৩। জমির উর্বরতা কম হলে প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি হারে পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিন।
৪। সেচ, নিকাশ ও পরিচর্যার সুবিধের জন্য ১২৫ সে.মি. চওড়া যে কোন দৈর্ঘ্যের বেড বা জমি খন্ড চিহ্নিত করুন।
৫। দুটো বেডের মাঝে ৫০ সে.মি এবং বেড ও আইলের মাঝে ২৫ সে.মি জায়গা ফাঁকা রাখুন।
৬। এবার ফাঁকা জায়গাগুলো থেকে গভীরভাবে ১০ - ১৫ সে.মি মাটি তুলে নিয়ে বেডের উপর দিন। এতে সেচ বা নিকাশের জন্য নালা তৈরি হবে।
৭। এখন বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের লাঠি দিয়ে সমান করে নিন। বেডের মাটি (কাঁদা) অত্যধিক নরম হলে কিছু সময় অপেক্ষা করে কাদা একটু শুকিয়ে নিন। কারণ কাঁদা বেশি নরম হলে বীজ অনেক নিচে চলে যায়। এতে চারা তুলতে মারাত্মক অসুবিধা হয়।
৮। বীজ ভিজিয়ে বাড়িতে চারা গজিয়ে নিতে হয়। এরপর এই গজানো বীজ প্রতি বর্গমিটারে ৮০ - ৯০ গ্রাম হারে বেডের উপর ছিটিয়ে দিন এবং নালাগুলো পানি দ্বারা ভর্তি করে রাখুন।
৯। বীজতলার আগাছা, পোকামাকড় বা রোগের প্রকোপ দেখা দিলে তা দমনের ব্যবস্থা নিন।
১০। ধানের চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭-১০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিন।
১১। চারা উত্তোলন করার পূর্বে বীজতলার মাটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন। এতে মাটি নরম হবে এবং সহজে চারা তোলা যাবে।
১২। এবার ধানের ভিজা বীজতলা তৈরির কাজটি ব্যবহারিক ক্লাসে কোন জমিতে অনুশীলন করুন এবং বীজতলার জমি নির্বাচন থেকে শুরু করে চারা উঠানো পর্যন্ত কাজের ধারা আপনার ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

বিষয় -৩ : ধানের ভাসমান বীজতলা তৈরি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

• বীজ • কাদা • বাঁশের চাটাই বা কলার ভেলা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

যখন কোন এলাকা সম্পূর্ণভাবে বন্যায় ডুবে যায় এবং চারা উৎপাদন করার মতো কোন জায়গা বা জমি থাকে না, সেক্ষেত্রে ভাসমান বীজতলা তৈরির মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা হয়।

কাজের ধারা

১। বাঁশের চাটাই দ্বারা মাচা তৈরি করে বা কলার ভেলা তৈরি করে তার উপর ২-৩ সে.মি পরিমাণ সমান করে কাঁদার প্রলেপ দিন।
২। এরপর ভিজা বীজতলার মতো গজানো বীজ কাঁদার উপর ছিটিয়ে দিন।
৩। মাচা বা কলার ভেলা যাতে বন্যার পানিতে ভেসে না যায় সেজন্য খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখুন।
৪। এ ধরনের বীজতলায় সাধারণত পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে প্রয়োজন হলে ছিটিয়ে পানি দেয়া যেতে পারে।
৫। পোকামাকড় বা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে তা দমনের ব্যবস্থা নিন।

৬। চারা রোপণ করার উপযোগী হলেই তুলে ফেলুন।
৭। এবার ভাসমান বীজতলা তৈরির কাজটি আপনার স্কুলের পাশে কোন জলাশয়ে অনুশীলন করুন এবং এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজের ধারা আপনার ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

বিষয় -৪ : ধানের দাপোগ বীজতলা তৈরি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

● বীজ ● পলিথিন শীট, কলাপাতা, পাকা মেঝে ● শুকনো জায়গা ● পানি ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বর্ষার পানিতে যে জায়গায় বীজতলা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে একেবারে কৃত্রিম পরিবেশে চারা উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা মাটি থেকে কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে চারা বীজে সঞ্চিত খাদ্য খেয়েই বেঁচে থাকে। এ জন্য ১৩-১৪ দিন বয়সের চারা তুলে নিয়ে মূল জমিতে লাগাতে হয়।

কাজের ধারা

১। মাটির উপর পলিথিন শীট বা কলাপাতা বিছিয়ে নিন শুধু বা পাকা মেঝে ব্যবহার করুন।
২। পলিথিন শীট বা কলাপাতা বা পাকা মেঝের চারদিকে একটু উঁচু করে বাঁধ দিন যাতে পানি দিলে তা বের হয়ে না যেতে পারে।
৩। এরপর প্রতি বর্গমিটারে ১ কেজি হারে গজানো বীজ খুব ঘন করে ছিটিয়ে দিন।
৪। ছিটানোর পর বীজগুলো হাত দ্বারা হালকাভাবে চেপে দিন।
৫। বীজতলায় প্রস্থ ১ মিটার রাখা বাঞ্চনীয়। এতে পরিচর্যায় সুবিধা হয়।
৬। বীজে সঞ্চিত খাদ্য খেয়েই চারাগুলো বেঁচে থাকে বলে কোন সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে চারার বৃদ্ধি অত্যন্ত কম হলে সেক্ষেত্রে ১% ইউরিয়া দ্রবণ ছিটিয়ে দিন।
৭। প্রায় ১৩-১৪ দিন পর চারা ৭-১১ সে.মি. লম্বা হয়। এ সময় চারা তুলে মূল জমিতে কম পানিতে রোপণ করতে হয়।
৮। দাপোগ পদ্ধতিতে ধানের চারা উৎপাদনের কাজটি অনুশীলন করুন এবং ব্যবহারিক খাতায় এর কার্যধারা লিপিবদ্ধ করুন।

বিষয় - ৫ : ধানের পোকা সংগ্রহ ও সনাক্তকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পোকা ধরার হাতজাল;
- প্লাস্টিকের ছোট কৌটা বা পেট্রিডিস;
- কিলিং জার;
- চাকু বা ছুরি;
- সাকসন সংগ্রাহক;
- তুলি ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ধানের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। ঐসব পোকা সংগ্রহ করতে হলে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ অবশ্যই ধানের ক্ষেতে যেতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধানের সব পোকা একই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। একেক পোকার জন্য একেক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

কাজের ধারা

১। হাতজাল দিয়ে ধান ক্ষেতে সুইপিং করে পোকা সংগ্রহ করলে ও কিলিং জারে রাখুন। এক্ষেত্রে পোকাগুলো অবশ্যই পাতা ফড়িং বা গান্ধী পোকা বা পামরি পোকা অন্য কোন পোকার মথ হবে।

২। পেঁয়াজ পাতা বিশিষ্ট গাছ চিড়ে তার মধ্য থেকে কীড়া সংগ্রহ করুণ ও পেট্রিভিসে রাখুন। এটা অবশ্যই গলমাছির কীড়া হবে।

৩। ধান গাছের মোড়ানো পাতা সংগ্রহ করুন এবং এর ভিতর থেকে শুককীট সংগ্রহ করে পেট্রিভিসে রাখুন। এটা অবশ্যই পাতা মোড়ানো পোকা হবে।

৪। মাটিতে বা ধান গাছের আড়াল থেকে খুঁজে পোকা সংগ্রহ করুন ও কৌটা বা পেট্রিডিসে রাখুন। এটা লেদা পোকা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে।

৫। ধানের মরাডিগ বা সাদা শীষ টান দিয়ে তুলে তার গোড়া থেকে কীড়া সংগ্রহ করুন। এটা মাজরা পোকা হবে।

৬। ধানের জমিতে রাতে আলোর ব্যবস্থা (হ্যাজাক বা লাইট পোস্ট ইত্যাদি করতে পারলে অনেক পোকার মথ শোষক পোকা ও পাতা ফড়িং আলোতে আকৃষ্ট হয়ে কাছে চলে আসে। এ সময় এগুলো ধরে কৌটায় বা কিলিং জারে রাখুন।

৭। উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলোর প্রতিটি প্রয়োগের মাধ্যমে পোকা সংগ্রহ করুন। এবং বইতে দেয়া চিত্রের সাথে মিলিয়ে বা শ্রেণী শিক্ষকের সহায়তায় তা সনাক্ত করুন।

৮। ধানের পোকা সংগ্রহের কাজগুলো অনুশীলন করুন এবং তা সনাক্ত করে ব্যবহারিক খাতায় চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করুন।

বিষয় - ৬ : পাট জাগ দেয়ার উন্নত পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পাট
- বাঁশ
- রশি
- কম স্রোতযুক্ত পানি বা বদ্ধ পানি
- কচুরিপানা বা পাথর বা কংক্রীটের খন্ড
- ইউরিয়া

কাজের ধারা

১। পাট কাটার পর চিকন ও মোটা পাট বাছাই করে পৃথক পৃথকভাবে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে নিন।
২। আঁটিগুলোর একটির মাথা অন্যটির গোড়া দ্বারা ঢেকে ৪-৫ দিন স্তূপ করে রাখার পর ঝাড়া দিলে পাতা ঝরে পড়বে।
৩। এরপর পানির ভিতর ৩-৪ দিন গোড়া নিচের দিকে রেখে স্তূপ করে রাখতে হবে যাতে গোড়াতে আগেই পচন ক্রিয়া শুরু হয়।
৪। আঁটিগুলোর গোড়া মাথা একসাথে সাজিয়ে নিয়ে বর্গাকার বা আয়তাকার জাগ তৈরি করে নিন। এর উপর একই নিয়মে আরও একটু স্তর সাজান।
৫। বদ্ধ পানিতে জাগ দিলে সেক্ষেত্রে প্রতি ১০০ আঁটির জন্য ১ কেজি হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন।
৬। জাগ দেয়ার সময় যাতে জাগের উপর কমপক্ষে ৩০ সে.মি. এবং নিচে কমপক্ষে ৬০ সে.মি. পানি থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন।
৭। বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো বাঁশ বা কাঠের খুঁটির সাথে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া। তবে কচুরিপানা, পাথর বা কংক্রীটের খন্ড দিয়েও ডুবানো যেতে পারে।
৮। তত্ত্বীয় অংশের বর্ণানুযায়ী পাটের পচনক্রিয়ার শেষ সময় নির্ণয় করুন এবং শুকনো জায়গায় বসে বা কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের অংশ পৃথক করে নিন।
৯। এরপর আঁশগুলো পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিয়ে বাঁশের আড়ায় শুকিয়ে নিন এবং ভালো করে বেঁধে সংরক্ষণ করুন।
১০। পাট জাগ দেওয়ার পদ্ধতিটি অনুশীলন করুন এবং তা আপনার ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

বিষয় -৭ : ধান, পাট, আলু, সরিষা ও মসুর ডালের যে কোন একটি ফসলের চাষাবাদ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- জমি
- জমি তৈরির যন্ত্রপাতি
- বীজ বা চারা
- সার
- আপদনাশক

কাজের ধারা

১। উপরিউক্ত ফসল ৫টি যে কোন একটির জন্য উপযোগী জমি নির্বাচন করুন।
২। জমিটি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করুন।
৩। প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিন।
৪। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ বা চারা জমিতে বপন বা রোপণ করুন।
৫। প্রয়োজনে কোন সার উপরি প্রয়োগ করুন।
৬। আগাছা, পোকামাকড় ও রোগ দেখা দিলে তা দমনের ব্যবস্থা নিন।
৭। সেচ বা নিকাশের প্রয়োজন হলে তা কার্যকর করুন।
৮। পরিপক্ব হলে সঠিক সময়ে তা কেটে নিন।
৯। এরপর মাড়াই ও ঝাড়াই করে ফসল দানা পরিষ্কার করে নিন।

১০। ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে নিন।
১১। এরপর সঠিক জায়গায় সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করুন।
১২। উপরিউক্ত কাজগুলো যে কোন একটি ফসলের জন্য অনুশীলন করুন এবং তা আপনার ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

উল্লেখ্য ধান, পাট, আলু, সরিষা ও মসুর ডালের চাষাবাদের প্রযুক্তি তত্ত্বীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন :

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২। ধানের বীজতলা কয় ধরনের ? যে কোন একটির বর্ণনা দিন।
৩। ধানের জমিতে সার প্রয়োগের নীতিমালা ব্যাখ্যা করুন।
৪। ধানের ক্ষতিকর কয়েকটি পোকার নাম লিখুন এবং এদের দমন ব্যবস্থা উল্লেখ করুন।
৫। দেশী ও তোষা পাটের কয়েকটি জাত উল্লেখ করুন এবং এদের বপণ সময় ও বীজহার উল্লেখ করুন।
৬। পাট ফসলের আন্তঃ পরিচর্যার বিবরণ দিন।
৭। পাটের পাতা ঝরানো ও গোড়া পানিতে ডুবিয়ে রাখার প্রযুক্তিগত দিক কি?
৮। পাট জাগ দেওয়ার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৯। কিভাবে পাট পচনের সমাপ্তি নির্ণয় করবেন?
১০। পাটের কয়েকটি ক্ষতিকর পোকা ও রোগের নাম উল্লেখ করুন।
১১। পাটের আঁশ ছাড়ানোর কৌশল ব্যাখ্যা করুন।
১২। আলুর কয়েকটি স্থানীয় ও উন্নত জাতের নাম লিখুন এবং এদের রোপণ পদ্ধতি আলোচনা করুন।
১৩। আলু ফসলে সার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
১৪। কিভাবে আলু ফসল উত্তোলন ও সংরক্ষণ করা হয় তা লিখুন।
১৫। সরিষার বিভিন্ন জাত, বপন সময় ও বীজহারের একটি তালিকা দিন।
১৬। সরিষা ফসলে একটি করে পোকা, রোগ ও পরগাছার নাম দিন এবং এদের দমন ব্যবস্থা উল্লেখ করুন।
১৭। ডাল ফসলের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
১৮। ডালকে গরিবের মাংস বলা হয় কেন?
১৯। মসুর ডালের জমি নির্বাচন, তৈরি ও বপন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১ :	১। খ	২। গ	৩। ঘ	৪। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২ :	১। খ	২। ক	৩। গ	৪। ঘ	৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩ :	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। ঘ	৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪ :	১। ক	২। ঘ	৩। খ	৪। গ	৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫ :	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। ঘ	